সংবাদ

31 MAY 2017

'হোমওয়ার্ক' নয়, স্কুলের কাজ চাই

আলমগীর খান

আমাদের দেশে যার বাড়ির কাজের ধারণা নেই, সে যে কস্মিনকালে ইশকুলে যায়নি এ কথা নিশ্চিত। যার ইশকুলে যাওয়ার সৌভাগ্য হয়নি, সে বাড়িতে অনেক কাজকর্ম করলেও 'বাড়ির কাজ' বোঝার ক্ষমতা রাখে না, কারণ সে এক অত্যাশ্চর্য ভিন্ন জিনিস। বাড়িতে বসে পড়ালেখা। ইশকুলের কাজ কী? শিশুরা ইশকুলে যায় কেন– পড়ালেখা করতে। কিন্তু ইশকুলের অনেক কাজ– ছাত্রছাত্রীর নাম ডাকা, পড়া ধরা মানে বাড়ির কাজ শেখা হয়েছে কিনা তা পরীক্ষা করা, আবার পরের দিনের বাড়ির কাজ দেয়া, বাড়িতে পড়ালেখার কাজটা কীভাবে হবে তা বাতলে দেয়া মানে প্রাইভেট/কোচিং ও নোট/গাইড বই সম্পর্কে উচ্চ ধারণা প্রদান, ক্লাস টেস্ট, পরীক্ষা আয়োজন ইত্যাদিসহ স্কুলে কাজের শেষ নেই। এতসব করে আবার ছাত্রছাত্রীকে জ্ঞানচর্চা করানোর সময় থাকার কথা নয়, স্বাভাবিক। এই পড়ালেখা করানোর কাজটি তাই ইশকুল বাইরে কন্ট্রাক্টরি দিয়ে থাকে। বাইরে মানে বাড়িতে– শিক্ষার্থীর নিজের বা শিক্ষকের বা কোচিং সেন্টারের।

পড়ালেখা করার জন্য বিদ্যালয় বানানো হয়। বিদ্যালয় মানে এক বা একাধিক কক্ষবিশিষ্ট দালান, কয়েকজন শিক্ষক, অনেক শিক্ষার্থী, বইপুস্তক-খাতা-কলম, ব্ল্যাকবোর্ড, পরীক্ষা, শিশুদের খেলার জায়গা– এইসব। তবে একটি মূল বিষয় এই তালিকা থেকে বাদ পড়ে যাচ্ছে– পড়ালেখা। কিন্তু এমন এক সময় ছিল যখন উল্লেখ করার মতো স্কুলঘর ছিল না, বই-খাতা-কলমের অভাব ছিল, অভাব ছিল চেয়ার-টেবিল-বেঞ্চসহ অন্যান্য উপকরণের। তবে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে সম্পর্ক ছিল পিতামাতা ও সন্তানের তুল্য। গ্রামে শিক্ষকগণ পণ্ডিত হিসেবে পরিচিত ছিলেন। উপকরণের অভাব নিয়ে সেসব বিদ্যালয় থেকে এমন অনেক মানুষ বেরিয়েছেন যারা আজ আমাদের জীবনে স্মরণীয়-বরণীয়। অতএব সেখানে বিরাট উপকরণের বহর না থাকলেও যা ছিল তা হচ্ছে পড়ালেখা– যেটা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠারই মূল উদ্দেশ্য। সেই মূল উদ্দেশ্য সেখানে ফলপ্রসূ হতো। শিক্ষার মান নিচে নেমে গেছে এমন অভিযোগ তখন শোনা যায়নি। শিক্ষিত মানুষ মানে জ্ঞানী ও চরিত্রবান– এই বিশ্বাস ছিল মানুষের মনে।

শিক্ষার মান নিচে নেমে যাওয়ার অভিযোগ নিকট অতীত থেকে শুরু হয়েছে। যতই দিন যাচ্ছে এ অভিযোগ পরিমাণে ও মাত্রায় বাড়ছে। এখন এ নিয়ে রীতিমতো হৈচৈ চলছে। অথচ এখন উন্নতমানের বিদ্যালয়, বই-খাতা-কলম, চেয়ার-টেবিল-বেঞ্চসহ বিভিন্ন উপকরণের সমারোহ। শিক্ষক ও শিক্ষার্থী তো আছেই। তাহলে শিক্ষামানের এ দুর্দশা কীসের জন্য? কারণ স্কুলের যে মূল উদ্দেশ্য পড়ালেখা– সেটাই আশানুরূপ হচ্ছে না। কিন্তু পড়ালেখা হচ্ছে না বললে আমাদের দেশের দিনরাত জেগে-পড়া পরিশ্রমী ছেলেমেয়েদের সম্পর্কে মিথ্যা কথা বলা হবে। তারা শুধু পড়ছেই না, আগের যে কোন আমলের চেয়ে বেশি পড়ছে, তথ্য হিসাব করলে তারা জানছেও বেশি। আর পড়ছে তো মনে হয়, পৃথিবীর যে কোন উন্নত দেশের ছেলেমেয়ের চেয়ে বেশি। পড়ালেখার ভারে আমাদের শিশুরা কুঁজো হয়ে পড়ছে। বইয়ের ভারে শিশুর পিঠ যাতে বুড়োবুড়ির মতো বাঁকা হয়ে না যায় সেজন্য কিছুদিন আগে এ ব্যাপারে উচ্চ আদালত নির্দেশনা দিয়েছে। পার্শ্ববর্তী ভারতেও তাই। তাহলে শিক্ষার মান নিচে নামছে কেন?

প্রথমত অনেক পড়ছে বটে, কিন্তু কী পড়ছে সেটি জানা গুরুত্বপূর্ণ। অনেক খেলেই হয় না, কী খাচ্ছে সেটি যেমন গুরুত্বপূর্ণ। শিশু গাছ থেকে সদ্য-পড়া পাকা আমটি খাচ্ছে, নাকি বোতলে ভরা আমের জুস খাচ্ছে। ছিটেফোঁটা আমের রস দিয়েই বোতলের ম্যাংগো জুস বানানো যায়। এজন্য প্রয়োজন আমের স্বাদ ও ঘ্রাণের ক্ষতিকারক রাসায়নিক দ্রব্যসমূহ। এরকম আমের জুস খেয়ে পেট ভরলেও আম খেয়েছে বলা যাবে না। বাজারে লিচুর স্বাদ ও ঘ্রাণের জেলিও পাওয়া যায় যা শিশুদের কাছে বেশ প্রিয়। প্রচারণা ও বিজ্ঞাপনের দৌলতে এসব কৃত্রিম জুস ও লিচুকে সেরা আমরস বা লিচু বলে সাধারণ মানুষকে বিশ্বাস করানোও যায়। কে কী কীভাবে বানাচ্ছে তা এখানে আলোচনার নয়, কথাটা যেজন্য পাড়া হলো তা হচ্ছে– শিশু প্রকৃতির আমের মতো প্রকৃত শিক্ষা পাচ্ছে, নাকি বোতলজাত কৃত্রিম শিক্ষা পাচ্ছে যা স্বাদে ও ঘ্রাণে ১০০% শিক্ষার মতো হয়েও তাতে শিক্ষার ছিটেফোঁটা নাও থাকতে পারে, বরঞ্চ হতে পারে ক্ষতিকারক। তবে সব শিশুই যে এ ক্ষতিকর পরিস্থিতির শিকার হবে তা নয়, বেশিরভাগ হয়– বিশেষ করে যারা দরিদ্র ও প্রান্তিক শ্রেণীর।

আমাদের বেশিরভাগ শিশুর পড়ার বই কী-কী আছে? একমাত্র সরকারের দেয়া বিনামূল্যের পাঠ্যপুস্তক কখানা। তাও অনেকসময় শিশু-উপযোগী দৃষ্টিনন্দন হয় না, থাকে ভুলভাল। এর বাইরে শিশুগ্রন্থ কোথায় আমাদের শিশুরা পাবে? কয়টি স্কুলে বা এলাকায় মজার শিশুগ্রন্থের পাঠাগার আছে? ঢাকায় অভিজাত এলাকার বাইরে এসব পাওয়া সহজ নয়। ব্যয়তো আছেই। বেশিরভাগ বাবামায়েরও শিশুমনের বিকাশ সম্পর্কে সঠিক ধারণা নেই। সুতরাং দিনরাত আমাদের ছেলেমেয়েরা আসলে কী পড়ে? প্রধানত নোট/গাইডবই যা বাজারে কিনতে পাওয়া যায়, আবার যা গৃহশিক্ষক ও কোচিং সেন্টারও দেয়। অর্থাৎ তারা পাঠ্যপুস্তকের পড়াটাই বুঁদ হয়ে পড়ে, তবে অনেকক্ষেত্রেই তা পাঠ্যপুস্তক থেকে নয়, নোট/গাইডবই থেকে যাকে পাঠ্যপুস্তকের নকল বলা যায়।

দ্বিতীয়ত কোথায় পড়ে? ইশকুলে? না, ঘরে-বাড়িতে বা কোচিং সেন্টারে। স্কুলে নয় কেন? স্কুল তো বানানোই হয় পড়ালেখার জন্য। এর কারণ, স্কুলে সত্যিকারভাবে শেখার সময় ও সুযোগ নেই যদিও অনেক উপকরণে তা সমৃদ্ধ। স্কুল থেকে 'বাড়ির কাজ' দেয়া হয়। স্কুল এভাবে পুরো কাজটাকে ভাগ করে নিয়েছে। নিজের কাজ হিসেবে অনেক কিছু রেখেছে, কিন্তু একটিমাত্র কাজ যা কিনা মূল সেই পড়ালেখাকে বাইরে ঠিকাদারি দিয়েছে– তারই মহান নাম 'বাড়ির কাজ'। লোকজন এ ব্যবস্থা দিব্যি মেনে নিয়েছে কেননা সবার ক্ষতি হচ্ছে না। ঠিকাদারিতে অনেকের রুটিরুজি হয়। ধনিক শ্রেণীর মানুষের আপাতদৃষ্টিতে কোন ক্ষতি হচ্ছে না। বৈষম্য তৈরি হচ্ছে বলে তাদের একরকম লাভই হচ্ছে। আর যে নিরক্ষর বাবামায়ের ও দরিদ্র পরিবারের সন্তানের ক্ষতি হয় তাদের কিছুই বলার ও করার নেই, বলির পাঁঠা হওয়া ছাড়া।

এত সহজেই কি মানুষকে বলির পাঁঠা বানানো যায়? যায়। ব্রিটিশ আমলে ১৭৭০ সালে ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে বাংলার ৪ কোটি মানুষের মধ্যে ১ কোটি না খেয়ে মারা যায়, কিন্তু কোন ক্ষুধার্ত মানুষ শস্যের গোলা বা খাবারের দোকান লুট করতে যায়নি। নোবেল পুরস্কার বিজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন ক্ষুধার্ত মানুষের এই মর্মান্তিক নীরবতার কথা উল্লেখ করেছেন তার একটি বইতে। এখন দেখছি পেটভরা মানুষেরাই লুণ্ঠন করে, খেটে খাওয়ারা না। সেই চরম দুর্ভিক্ষের দিনে ক্ষুধার্ত মানুষের কাছে হিসাবটা খুব সহজ ছিল, স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল, তবু তারা মুখ বুঁজে সহ্য করা আর মরা ছাড়া কিছু করেনি। আজকে 'বাড়ির কাজ' নামের এই অন্যায় ব্যবস্থা তারচে অনেক প্যাঁচানো জটিল হিসাব। যারা ভুক্তভোগী তাদের এক্ষেত্রে তেমন কিছু করার নেই। কিন্তু নীতিনির্ধারকগণ চাইলে এ অন্যায় বন্ধ করে দিতে পারেন।

বাড়ির কাজের জন্য আমাদের স্কুল-কলেজের শিক্ষকগণ দায়ী নন, যদিও তাদের কেউ কেউ এ অবস্থার সুযোগ নিতে পারেন ও নেন। আমাদের দেশে এখনো অনেক মহৎ নিবেদিত-প্রাণ শিক্ষক-শিক্ষিকা রয়েছেন যারা ছাত্রছাত্রীকে সন্তানের মত দেখেন ও মনপ্রাণ দিয়ে তাদের শেখাতে চান। কিন্তু দশের চক্রে ভগবান অস্থির! বিদ্যালয়ে শিক্ষকের সংখ্যা বাড়াতে হবে, শ্রেণী-ঘণ্টা বাড়াতে হবে, স্কুলে ও এলাকায় ভাল বইয়ের পাঠাগার তৈরি করতে হবে, স্কুলে শিক্ষাকে আনন্দময় করতে হবে, উন্নত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষকদের আরো দক্ষ ও যোগ্য করে তুলতে হবে ও স্কুলের পড়া স্কুলেই তৈরি করার রীতি চালু করতে হবে। মুখস্থ ও পরীক্ষা-নির্ভর শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে বেরিয়ে না এলে 'বাড়ির কাজ' বন্ধ হবে না। পরীক্ষার সংখ্যা হিসাব করলে বাংলাদেশের স্কুলব্যবস্থা বিশ্বচ্যাম্পিয়নও হতে পারে, কিন্তু যেহেতু বিশ্বে এমন খেলা কোনদিন চালু হওয়ার সম্ভাবনা নেই, সে চেষ্টা অর্থহীন। পড়ালেখা স্কুলে হোক, পরীক্ষা হোক বাইরে বৃহত্তর জীবন ও জগতে।

এর মানে এই নয় যে, স্কুলে ভালো পড়ালেখার জন্য বা বাড়ির কাজ বন্ধ করতে হলে আবার আগের দিনের মতো গাছতলায় বসে তালপাতায় লেখা শুরু করতে হবে। বিদ্যালয়ের সুযোগ-সুবিধা, আধুনিক প্রযুক্তি, উপকরণ ইত্যাদি পর্যাপ্ত পরিমাণে চাই। কিন্তু সবচেয়ে বেশি চাই আমাদের ছেলেমেয়ে স্কুলে গিয়ে পড়ালেখা শিখুক। স্কুলে কী-কী হয়, তার বিরাট তালিকা দেয়া যাবে। কিন্তু সেই তালিকা স্কুলেই ঝুলানো থাকুক। আমরা কেবল জানতে চাই– তারা পড়ালেখা শিখছে কি? নাকি স্কুল থেকে বাড়ি ফিরছে এক বস্তা 'বাড়ির কাজ' নিয়ে– যা আসলে স্কুলের কাজ। ছেলেমেয়েরা বাড়ি এসে বাড়ির কাজতো করবেই– সংসারের আনন্দময় টুকটাক কাজ, খেলাধুলা, মজার বই পড়া এসবই তার আসল বাড়ির কাজ। এখনতো স্কুলের কাজকেই মিথ্যামিথ্যি 'বাড়ির কাজ' বলে চালানো হচ্ছে। এই বাড়ির-কাজওয়ালা ঠিকাদারি মার্কা বিদ্যালয় ব্যবস্থা নয়, 'স্কুলের কাজ' চাই– আসল কাজ, ভালো পড়ালেখা। স্কুলের কাজওয়ালা ইশকুল চাই।

ব্যানবেইস
পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং.....
তারিখ.....

চীফ, পরিসংখ্যান বিভাগ	
চীফ, ডি.এল.পি বি ভাগ	
সিস্টেম এনালিস্ট	
সিস্টেম ম্যানেজার	
প্রশাসনিক কর্মকর্তা	
পি.এ.	

কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে
ধন্যবাদ